অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সময়টা এখন এমনই ।।

ভেবেছিলাম কালের কণ্ঠ-র বুধবার ২ জুনের রিপোর্ট ' বিরল ভালবাসা' শীর্ষক আবেগ এবং অভূতপূর্ব বিষয়টি নিয়ে নিজের আবেগ অনুভূতির কথা কিছু লিখবো। ইচ্ছে ছিলো সে লেখার মধ্যে দিয়ে গফরগাঁয়ের প্রয়াত ভ্যান চালক হাশমত আলী, তাঁর স্ত্রী রমিজা খাতুন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণঢালা ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাবো। ভেবেছিলাম দেশপ্রেম, সংগঠন এবং প্রাণপ্রিয় নেতার প্রতি এমন নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত ভালবাসা নিয়ে কিছু কথা বলবো। ভালবাসার গল্প কে না বলতে চায়! কে না শুনতে চায়! আরো ভেবেছিলাম সে রিপোর্টের প্রতিবেদক হায়দার আলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো এমন একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনের জন্য, যে প্রতিবেদনে জেনেছিলাম বঙ্গবন্ধুপাগল হাশমত আলী তাঁর প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর অস্থিরতায় কাটিয়েছেন তাঁর কন্যার (শেখ হাসিনা যাঁকে হাশমত আলী নিজের কন্যা জ্ঞান করতেন) কি হবে? সে চিন্তা করে ভ্যানের রোজগার থেকে সঞ্চয় করে শেখ হাসিনার নামে সাত কাঠা জায়গা কিনেছেন যা মৃত্যুর আগ পর্যন্তও বিক্রি করেননি যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আর্থিক অভাবে বিনা চিকিৎসায়।

অনুকরনীয় ভালবাসার এক সত্য গল্প। বিশেষ করে যাঁরা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দলকে ভালবাসেন তাঁদের জন্য। এমন নির্মোহ ভালাবাসার কথা কার না লিখতে - বলতে ইচ্ছে করে! লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার (৩ জুন) হতভম্ব হয়ে গেছি নিমতলীর ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের খবরে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় 'কেয়ামত দেখিনি নিমতলী দেখেছি'। এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমার শব্দরা হারিয়ে গেলো - আমি বিরল ভালবাসার গল্পের পাত্র-পাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সবার কথা ভুলে গেলাম। কিছুই লিখতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম এটাও বোধহয় কেবল বাকী ছিলো। আমাদের দেশে মৃত্যু কত প্রকার এবং কি কি তার উদহারণের সঙ্গে এবার আরেকটি যোগ হলো। কিন্তু আর কত এভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু?

মঙ্গলবার অর্থাৎ এরই দুদিন আগে বেগুনবাড়ীতে পাঁচতলা ভবন ধ্বসে প্রাণ হারালেন ২৫ জন। বৃহস্পতিবার নিমতলীতে ১১৭ জন (পরে হাসপাতালে আরো চারজন এবং এখনো অনেকের অবস্থা

আশংকাজনক) যার অধিকাংশই নারী এবং শিশু। মানুষ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের মা বাবা ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন আগুনে পুড়ে মরে যাচ্ছে অথচ বাঁচনোর কোন পথ খোলা নেই। আমরা যদি নিজেদেরকে এ দুই আসনের একটিতে (আগুনে পুড়ছি অথবা চোখের সামনে দেখছি আমার প্রাণপ্রিয় মা বাবা বা সন্তান পুড়ে মরে যাচ্ছে) বসিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভাবার চেষ্টা করি তবে কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারবো সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কথা 'কেয়ামত দেখিনি নিমতলী দেখেছি'। অনেকটা যেন সেই নিউইয়র্কের ৯/১১।

তবে এখানেও মানুষ যারপরনাই ছুটে এসেছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সব কিছু দিয়ে। একজন তো জেনে শুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণটাই বিসর্জন দিয়েছেন উদ্ধার কাজে। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। যেমন করে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন তাঁর অজানা বোন পথের ভিখারী রমিজা খাতুনকে নিয়ে তেমনি জড়িয়ে কেঁদেছেন রুনা রত্না দু'বোন এবং আসমাকে ধরে। মা হারা মেয়ে গুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের বিয়ের দায়িত্বটুকুনও নিয়েছেন। গণভবনে নিজ দায়িত্বে নিজের মেয়ে হলে যা যা করা প্রয়োজন তাই করে জাঁকজমক বিয়ের আয়োজন করেছেন। যে আগুনের লেলিহান ওদের স্বজন এবং স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী ওদের ঘর বাঁধার স্বপ্নটা যথার্থই পূরণ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ মহানুভবতায় কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমাদের। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ সবার জন্য যা কিছু করার সব টুকুই করছেন স্বীয় তত্ত্বাবধানে। তেমনি জানপ্রাণ দিয়ে খাটছেন সংশ্লিষ্ট সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু এমনতো নয় যে এখানেই শেষ। সে নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারে?

প্রশ্ন হলো ঢাকা শহর আর কত বোঝা নেবে বা নিতে পারবে! অতোটুকুন একটি শহর যার আয়তন বোধকরি ৩০৪ বর্গ কিলোমিটার সেখানে এক কোটির উপরে মানুষের বসবাস। আর গোটা অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার যেখানে বসবাস করছে মাত্র দু'কোটির কিছু বেশী মানুষ। গোটা বাংলাদেশের আয়তন সেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গ কিলোমিটার । যে ভাবে এই ঢাকা শহরে যুগের পর যুগ ধরে অপরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরী ও নগরায়ণ হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে করে এ শহর আর কতদিন বোঝা বইতে পারবে সেটাই প্রশ্ন। বেগুনবাড়ীর পর আরো বহুতল ভবন ফাটলসহ হেলে পড়ার খবর পত্রপত্রিকায় দেখছি আর আতংকিত হচ্ছি। যে পুরনো ঢাকাতে সেই বিভৎস অগ্নিকান্ড সেখানেই দেখা যাবে দু'আড়াই কাঠা জায়গার উপরে কেমন বহুতল ভবন গুলো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতি মুহূর্তে। বেগুনবাড়ীর মত অঘটন ঘটতে পারে যে কোন সময়ে। সরকার উদ্দ্যোগ নিয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন তালিকাভূক্ত করার এবং সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার। প্রশ্ন হলো কতগুলোকে? আর সেগুলো ভেঙ্গে ফেললে সেখানে যাঁরা এখন বসবাস করছেন তাঁদের কি হবে? পুরোন ঢাকায় শুধু নয় গোটা ঢাকা জুড়ে যে জন সংখ্যার চাপ তাতে ঠাঁসাঠাঁসি করে বসবাসরত মানুষ সব ধরনের ঝুঁকি নিয়েই বসবাস করছে। ফলে এমন আরো বেগুনবাড়ী নিমতলীর ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা গোটা ঢাকাকে ঘিরে। সরকার যেমন তাৎক্ষনিক ব্যবস্থার কথা ভাবছেন তেমনি ভাবা দরকার ভবিষ্যতের। ঢাকাকে ভেঙ্গেচুরে আবার নতুন করে পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা অবান্তর তবে যেটা করা সম্ভব সেটা হলো ঢাকার উপর চাপ কমানো। সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রীক না ভেবে ঢাকার বাইরে বিকেন্দ্রীকরণ ভাবতে হবে এবং সেটা কাগজে কলমে না

হয়ে বাস্তবিক অর্থে। আজকাল কথা উঠছে প্রাদেশিকীকরণের এবং আমার মনে হয় এ ব্যপারটা নিয়ে সিরিয়াসলী চিন্তা ভাবনা করা দরকার। অস্ট্রেলিয়ার প্রদেশের সংখ্যা ছয় এবং সমমানের দুটো টেরিটোরি। এমনি প্রদেশ আছে পার্শ্ববর্তী ভারত আমেরিকা কানাডাসহ আরো অন্যান্য দেশে। অধিকাংশ দেশের প্রদেশগুলোতে তাদের নিজস্ব একটা সরকার এবং আয়-ব্যয় আছে। ফলে প্রদেশগুলো মোটামুটি স্বয়ং সম্পূর্ন এবং দেখলে মনে হয় সব প্রদেশেরই জীবনযাত্রার মান সমান। তাই রাজধানীতে ধেয়ে আসার প্রবণতা নেই। বরং বেশরিভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একান্ত বাধ্য না হলে কেউ রাজধানীতে বসবাস করতে চায় না। এ কথা গুলো নতুন কিছু নয় এবং তা কম বেশী আমাদের সবার জানা। আমার মনে হয় ঢাকাকে বাঁচাতে সুদুরপ্রসারী এমন চিন্তা ভাবনা সরকারের করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী নিমতলী বেগুনবাড়ী দূর্ঘটনায় কষ্ট পেয়েছেন - দেখেছেন রাষ্ট্রের সকলের মনের কষ্ট তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার যেন এমন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করতে না হয় তার জন্য প্রয়োজন তড়িৎ এবং সুদুরপ্রসারী পদক্ষেপ। ঢাকা ক্রমশঃ মৃত্যু আতংক নগরী হোক এটা কারোরই কাম্য নয়। তবে চটজলদি ব্যবস্থা না নিলে তা হতে বাধ্য। সরকার সেদিকে সজাগ তবে সফলতা নির্ভর করছে সরকার কতটা আন্তরিক - তার উপর। নগর মেয়র বলেছেন অননুমোদিত বহুতল ভবনের ক্রমবর্ধমান স্থাপনা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন আর রাজউকের সমন্বয়ের অভাবের কারণে। একটি ভবনের স্থাপনার প্রয়োজনে সাত আট ঘাটে ফাইল যেতে হয়। তারপরও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দূর্নীতির কারণে সব ছাড় পেয়ে যায়। যতক্ষন পর্যন্ত দূর্নীতি দমন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভালো এবং সঠিক কাজ সফলভাবে হবার নয়। সরকার অবৈধ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অননুমোদিত ভবনের চিহ্নিত করণে টাস্কফোর্স গঠন করেছে তেমনি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরোন ঢাকায় আবাসিক ভবনে রাসায়নিক দ্রব্য মওজুদের অনুসন্ধান এবং তা বন্ধের ব্যবস্থা করার। কিন্তু সত্যি বলতে দূর্নীতির কবলে পড়ে এ সকল উদ্দোগের সফলতা হারিয়ে যায়। তাই ঘুষ দূর্নীতি প্রতিহত না হলে এসব অভিযানের সত্যিকারের ফল পাওয়া দুস্কর। তবে হ্যাঁ দূর্নীতি আর অবৈধ উপার্জন করে যে যেভাবেই পার পেয়ে যাক না কেন বহুতল ভবন ধ্বসে পড়লে তা বিবেচনায় আনবে না কে ন্যায়পরায়ন আর কে দূর্নীতিপরায়ন যেমন আগুন একবার লেগে গেলে দেখবে না ওটা কার বাড়ী অথবা তিনি কোন দলের। যা বলতে চাইছি তা হলো কেবল নিজের কথা ভাবলেই বাঁচা যাবে না অন্যকে বাঁচিয়েই নিজেকে বাঁচতে হবে। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিশাল ঝুঁকি - এ ঝুঁকি উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ সবার জন্যই। উন্নয়নশীল দেশগুলোর কার্বন ইমশিন না কমাতে পারলে তার খেসারত উন্নতদেশগুলোকেও দিতে হবে তাই সমগ্র বিশ্বই এখন একযোগে চেষ্টা করে যাচ্ছে পৃথিবীটাকে বসবাসের উপযোগী করে রাখতে। তেমনি জনবহুল ছোট্ট এই দেশটাকে বসবাসের উপযোগী করে রাখতে হলে সকলকে উদ্দ্যোগী হতে হবে। আমি একা ভালো থাকতে চাইলে এখন আর তা হবে না প্রতিবেশীকে সাথে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে। নইলে আমিও বাঁচবো না প্রতিবেশীও বাঁচবে না। সময়টা এখন এমনই।